॥ চতুর্থ অধ্যায় ॥

চতুর্থ পর্যায়ের নাটক : নাট্যমুক্তির পরিণতি

রবীন্দ্রনাথের নাটক রচনা এবং তাঁর নিজস্ব প্রযোদনায় সেইসব নাটকের মঞ্চ-প্রয়োগের বিশিষ্টতা সম্পর্কিত যে ইতিহাস আমরা পরিক্রমা করে এলাম, তাতে 'চির-কুমার সভা', 'শোধবোধ', 'গৃহপ্রবেশ', 'মুক্তির উপায়' 'বাঁশরি' 'পরিত্রাণ' ইত্যাদি নাটকগুলির কথা আসেনি এই কারণে যে এই নাটকগুলি প্রধানত সাধারণ মঞ্চে অভিনীত, এবং এই নাট্যরূপান্তরগুলি রচনার পশ্চাতে তাঁর নিজের আভিনয়িক প্রেরণার বদলে সাধারণ মঞ্চের তাগিদই বেশি কাজ করেছিল। এর কোনোটিই তিনি অভিনয়ের উদ্যোগ গ্রহণ করেন নি। এমন কি এদের মধ্যে এমন দু-একটি নাটক পাওয়া যাবে, যেগুলি সাধারণ মঞ্চেও অভিনীত হয়নি, হয়েছে অনেক পরবর্তীকালের গ্রুপ থিয়েটারে, বৈশিষ্ট্যপূর্ণ কিংবা বৈশিষ্ট্যহীন প্রয়োগে। 'তপতী'র পর তিনি প্রায় সম্পূর্ণত ব্যাপৃত থেকেছেন নৃত্যনাট্যে পৌঁছতে। স্বভাবতই এই নৃত্যনাট্যের মোহনায় পৌঁছবারও তাঁর একটি কৌতূহলজনক ইতিহাস আছে। রবীন্দ্রনাট্যচর্চার ইতিহাসে একেবারে শুরু থেকেই, 'বাল্মীকি প্রতিভা'র অভিনয় এবং তার নাট্যগড়নে নৃত্যের একটি অস্ফুট অসংস্কৃত অপ্রস্তুত ভূমিকা লক্ষ করা যায়, কিন্তু তার কারণ প্রধানত ছিল যে তিনি চেয়েছিলেন গানের ভাষায় নাট্যকে দৌড় করাতে। সেই প্রবল গীত-নাট্যকে অভিব্যক্ত করতে অভিনয় স্বভাবতই একটা ছন্দকে আশ্রয় করতে চাইছিল। কিন্তু দেখা গেল, ঐ পরীক্ষাটিতে তিনি যথেষ্ট সফল হলেন না — হয়তো বা তাঁর গীতি-আবেগের কাছে নাট্য পরাভূত হল বলেই তাঁর গীতিনাট্য হয়ে দাঁড়াল নাট্যের সূত্রে গানেরই মালা। পরে পরীক্ষাটি আরও একবার ফিরে আসে তাঁর হাতে। আর তার মাঝখানে পদ্যের বন্ধনে অভিনয়ের যে সংগীত তিনি খুঁজছিলেন, সে যখন তার উচ্ছ্বসিত প্রকাশ থেকে গদ্যের অন্তর্লীন সুরে শমিত হয়ে এল, তখনও দেখা গেল, নাটকে গীতি-সংযোজনার আবেগ তাঁর কাটে নি (দুই পর্বের দুই ব্যতিক্রম 'মালিনী' এবং 'ডাক-ঘর' এই ইতিহাসে দুটি উজ্জ্বল ব্যতিক্রম হলেও 'ডাকঘর' অভিনয়ে সাতটি গান যোজনার কথা নিশ্চয় আমরা মনে রাখছি)। এবং এইসব নাটকে নিসর্গ একটি উল্লেখ-যোগ্য চরিত্র হয়ে উঠছিল। ফলে এই পথেরও একটি মোড়ে পৌঁছে প্রকৃতির অন্তর্গত দ্বন্দ্ববিধুরতা তার গানময় শরীর নিয়ে তাঁকে পুনরায় নৃত্যাভিব্যক্তির দিকে টেনে নিয়ে

গেল। আর তাই 'ফাল্গুনী'র অভিনয়কালে, নৃত্যকলার সুষ্ঠু পদ্ধতি যখন পর্যন্ত গড়ে ওঠেনি, তখন কেবল বালকদের গানে নৃত্য-অবসর রাখা হল না, অভিনয়ে অন্ধ বাউলের বেশে মঞ্চের উপরে নেচে উঠলেন রবীন্দ্রনাথ। নিজেকে তাঁর "বিচিত্রের দূত" আখ্যা দেওয়ার একটি সম্ভবপর ভূমিকা রচিত হল এইভাবে। 'শারদোৎসব' থেকে 'ফাল্গুনী'র মধ্যে ঋতুগত মাহাত্ম্যকে নানাভাবে মানবজগৎ ও মানবচরিত্রের নাট্য-আধারে পরীক্ষণের পরবর্তী পর্যায়ে স্বাভাবিকভাবেই 'বর্ষামঙ্গল' উৎসবের (১৯২১) সূত্র ধরে এসেছে 'বসন্ত' (১৯২৩) 'শেষ বর্ষণ' (১৯২৫) 'সুন্দর' (১৯২৫) 'নটরাজ : ঋতুরঙ্গশালা' ('ঋতুরঙ্গ' নামে প্রচলিত, ১৯২৭) 'নবীন' (১৯৩১) এবং 'শ্রাবণগাথা' (১৯৩৪) ইত্যাদি "পালাগান" গুলি। প্রকৃতির রূপ-বৈচিত্র্যের মধ্যেই আছে এক ভিন্ন নাটক, প্রাচীন ধর্মীয় উৎসবের বা 'রিচ্যুয়াল'-এর ধরণে, কয়েকটি সূত্রধারক চরিত্রের সংলাপ-পরম্পরায় প্রধানত 'গানের মালা'তেই পরিবেশনা সেই নিসর্গসৌন্দর্যের যাবতীয় রহস্য ও তাৎপর্য। রবীন্দ্রনাথ অবশ্য এদের 'পালা-গান' বলেন এবং ভূমিকায় 'ফাল্গুনী' 'ঋণশোধ' বা অভিনীত 'শারদোৎসবে'র ধরণে চরিত্রদের পারস্পরিক কথোপকথনে পন্ডিত-সমালোচকদের তাঁর নাট্যসম্ভার সম্পর্কে বিরূপ মনোভাব পোষণের যাবতীয় সম্ভাবনাকে নির্মম কিন্তু শিল্পিত কটাক্ষে উড়িয়ে দেন, কিন্তু অভিনেয় কাহিনী বা চরিত্রের অভাবে এদের নাটক বলে মনে করে এদের মঞ্চরূপ বিষয়ে ভাবিত হবার সংগত কোনো কারণ নেই।[১] 'পাতা দিয়ে ঘিরে রাখা ফুলের গুচ্ছের মতো' (দ্র• ঘোষ, ১৯৮৫ : ৯২) এই গীতিমূলক প্রকৃতি-উৎসব-বিষয়ক রচনাগুলি বারবার পরিবেশিত হয়েছে শান্তিনিকেতন, জোড়াসাঁকো এবং কলকাতার মঞ্চে এবং প্রতিমাদেবীর ভাষায় এদেরই মধ্যে 'নৃত্যের প্রথম কাকুতি' (দ্র• দেবী প্র•, ১৩৫৬ : ১১) ফুটে উঠেছে। শান্তিদেব ঘোষের লেখাতেও প্রতিমা-দেবীর এই মন্তব্যের সমর্থন মেলে (দ্র• ঘোষ, ১৩৭৭ : ১৩)। একে বলা যেতে পারে নৃত্যের ছন্দে অভিনয়ের মুক্তি খোঁজার দ্বিতীয় এবং অপেক্ষাকৃত পরিণত স্তর। এদের মধ্যে ঋতুসম্ভারের সর্বাঙ্গীণ ব্যাপক আয়োজন আছে যে 'ঋতুরঙ্গ' পালায়, যে পালার নায়ক রবীন্দ্রনাথের সুদীর্ঘ জীবন ও শিল্পচিন্তার বিগ্রহ 'নটরাজ'- তার সমকালে, 'নটীর পূজা' অভিনয়ের শেষে, শ্রীমতীর আত্মনিবেদনের নৃত্যে কেবল অপরিণত নৃত্যাবেগই পরিণতি পায় নি, এই অভিনয়ের কিছু বছর আগে জাপান এবং

একবছর পরে, ১৯২৭ খ্রিষ্টাব্দে জাভাভ্রমণসূত্রে নৃত্যকে রবীন্দ্রমননে সুন্দরের শ্রেষ্ঠ প্রকাশ হিশাবে মনে করার বলিষ্ঠ অনুপ্রাণনা প্রায় এক সামাজিক বিপ্লবের ভূমিকা নিল। কিন্তু তার পরেও পূর্ণাঙ্গ নৃত্যনাট্যে পৌঁছতে রবীন্দ্রনাথ আরও সময় নিয়েছেন। প্রধানত প্রতিমা দেবীর উৎসাহ এবং আশ্রমের কিছু ছাত্রী শিক্ষকদের নৃত্যকলার নানান প্রাদেশিক, ধ্রুপদী ও লৌকিক রূপায়ণে দক্ষতা অর্জনের পর তিনি রচনা করেছেন তিনটি পূর্ণাঙ্গ নৃত্যনাট্য 'চিত্রাঙ্গদা' (১৯৩৬) 'চন্ডালিকা' (১৯৩৭) এবং 'শ্যামা' (১৯৩৮)। যথাক্রমে পদ্য ও পদ্য নাটক ও একটি কবিতা থেকে এদের জন্ম। তার আগে রবীন্দ্রনাথ পরিক্রমা করেছেন নানান কবিতা ও কথিকার সঙ্গে গান ও মূক-অভিনয়সহযোগী নৃত্যাভিনয়ের স্তর, যেমন 'শিশুতীর্থ' (ম্যাডান থিয়েটার ও য়ুনিভার্সিটি ইনস্টিটিউটে, সেপ্টেম্বর ১৯৩১) 'শাপমোচন' (জোড়াসাঁকোয় ১৯৩১-এর শেষে প্রথম অভিনীত, পরে লক্ষ্ণৌ, বোম্বে, সিংহল সহ শান্তিনিকেতন এবং কলকাতায় এম্পায়ার মঞ্চে অভিনীত, ১৯৩৪ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত) কিংবা 'শ্যামা'র পূর্বরূপ 'পরিশোধ' কবিতার অভিনয় (১০, ১১ অক্টো ১৯৩৬ এ শান্তিনিকেতনে এবং পরে কলকাতায়)। এছাড়াও চেষ্টা করেছিলেন প্রথম জীবনের গীতিনাট্য 'মায়ার খেলা' (১৮৮৮)-র নৃত্যনাট্য রূপে রূপান্তর ঘটাতে, কিন্তু সে প্রচেষ্টা থেকে গেছে অসম্পূর্ণ, অনভিনীত।

নৃত্যনাট্যে নাট্যগুণের যথেষ্ট অবকাশ থাকলেও যেহেতু বিভিন্ন বিশুদ্ধ নৃত্যশৈলীর আধারে রচিত এক বিশেষ ধরণের নাট্যাভিনয় — অন্তত সাধারণত নাটকের অভিনয়ে সংগীত ও নৃত্যের ছন্দ যতটুকু প্রয়োজন, তার চেয়ে আলাদা এক স্বতন্ত্র নাট্যভাষানির্ভর, তাই বর্তমান আলোচনায় রবীন্দ্র-নৃত্যনাট্যইতিবৃত্তে আমরা মনোনিবেশ করি নি। ফলে রবীন্দ্রনাথের জন্মশতবার্ষিকী বছর থেকে আজও পর্যন্ত কবিপক্ষে বিভিন্ন স্কুলে কলেজে পাড়ার ক্লাবে অথবা সাংস্কৃতিক সংগঠনে রবীন্দ্রনৃত্যনাট্য অভিনয়ের ক্রমাগত উৎসাহ কীভাবে পূর্বোক্ত নাট্যত্রয়ী নিঃশেষ করে হাত বাড়িয়ে তাঁর অনেক কবিতা গল্প ইত্যাদিরও 'নৃত্যনাট্য' রূপ পরিবেষণের অনন্ত ইতিহাস রচনা করে চলেছে, তার দিকেও আমরা দৃষ্টি নিবদ্ধ করছি না। আমরা এখানে কেবল লক্ষ করছি তাঁর দুটি নাটককে, যে দুটি রচিত হয়েছিল নৃত্যনাট্যেরই যুগে এবং রবীন্দ্রনাথ অভিনয় করেও দেখিয়েছিলেন তাদের যন্ত্ররূপ। এর একটি 'তাসের দেশ', প্রকাশ তারিখ ভাদ্র ১৩৪০; অন্যটি 'চন্ডালিকা' প্রকাশসময় এক, ঐ ভাদ্র ১৩৪০। প্রথমটির উৎসে ছিল 'গল্পগুচ্ছে'র অন্তর্গত 'একটি

আষাঢ়ে গল্প', অন্যটির উৎস ইতিহাসটি অবশ্য কিছু ভিন্ন। তবে লক্ষণীয়, দ্বিতীয়টিকে রবীন্দ্রনাথ নৃত্যনাট্যে রূপান্তরিত করলেও প্রথমটি তাঁর বিবেচনায় 'নাটিকা'ই থেকে গেছে। নৃত্যনাট্যের সুলভতার এই যুগে 'তাসের দেশ'ও বাঙালি অভ্যাসে 'নৃত্যনাট্যে' পরিবেশিত — এমন কি সম্প্রতি দেখা যাচ্ছে নৃত্য, নাটক অথবা রবীন্দ্রনাথের রচনাবলী বিষয়ে অত্যন্ত মনস্ক, সচেতন দর্শক সমালোচক মহলে যাঁর সৃজনধর্মী নৃত্যশিল্পের চর্চা অত্যন্ত প্রশংসালাভ করছে, যিনি নিজে " Tagore's Dance-Drama in Contemporary Dance Idiom" (C.Sircar, 1988 : 89-104) প্রবন্ধের রচয়িতা, সেই শ্রীমতী মঞ্জুশ্রী চাকী সরকারও তাঁর 'ডান্সার্স গিল্ড' সংস্থার পক্ষ থেকে "তাসের দেশ" নাটিকাটি নৃত্যনাট্যের আঙ্গিকেই পরিবেষণ করে থাকেন। শুধু তাই নয়, তাঁর সংস্থাটি "তোমারি মাটির কন্যা" নামে যে নৃত্যনাট্যটি পরিবেশন করে থাকেন, সেটি মূলত গদ্যনাটক 'চন্ডালিকা'-রই নৃত্যরূপান্তর, 'নৃত্য-নাট্য চন্ডালিকা' নয়। "আমি তোমারি মাটির কন্যা | জননী বসুন্ধরা" — এই গান-টিকে শ্রীমতী সরকার তাঁর ভাষ্যের সূচনায় এবং পরিসমাপ্তিতে ব্যবহার করেন, কিন্তু এই গানটি আছে গদ্যনাটক 'চন্ডালিকা'য়, তার নৃত্যনাট্যরূপটিতে নেই।

শ্রীমতী সরকার তাঁর পরীক্ষার পিছনে দুটি যুক্তি দর্শিয়েছেন। তাঁর ভাষায় সেই যুক্তি এইরকম — " Santidev Ghose has written that at one time he wanted to give a dance-interpretation to the prose-play "Chandalika". When placing the play next to the dance-drama, it seemed that characters of mother and daughter in the former are much more powerful and self-reliant." (Ibid : 99)

তাঁর এই যুক্তির কার্যকারিতা আমরা পরে বিবেচনা করব ; আপাতত এই প্রসঙ্গে শান্তিদেব ঘোষ "তাসের দেশ" রচনা ও নৃত্যাভিনয়ের ইতিকথা' (দ্র. ঘোষ, ১৩৮৫ : ৭৩-৮৬) ব্যাখ্যা করতে গিয়ে যে আলোচনা করেছেন, তার সূত্র ধরে আমরা বুঝতে পারি, ১৯২৪ খ্রিষ্টাব্দে 'রূপরতনে'র মূকাভিনয়ের যে পদ্ধতি রবীন্দ্রনাথ মঞ্চে রূপায়িত করেছিলেন তারই সূত্র ধরে তিনি অভিনয়ের এক নূতন ধারা প্রবর্তনে মনোযোগী হয়ে উঠেছিলেন। আমরা আগেই দেখিয়েছি "রঙ্গমঞ্চ"

প্রবন্ধে তিনি নাটকের পাঠ বিষয়ে যে গুরুত্ব অর্পণ করতে চেয়েছিলেন, তার টানে নাটকের পাঠ দীর্ঘকাল ধরেই তাঁর কাছে এক স্বতন্ত্র মর্যাদা পেয়ে আসছিল। 'অরূপরতন' এবং 'নটীর পূজা' অভিনয়ের সমকালে অর্থাৎ ১৯২৬ খ্রিষ্টাব্দ থেকে ছবি আঁকার নেশা তাঁকে রীতিমতো পেয়ে বসেছিল এ কথা তাঁর এক জীবনীকার বলেছেন (দ্র. মুখোপাধ্যায়, ১৩৫৯, '১৩৯৭' : ৪৩০) "বৎসর বারো-তেরোর মধ্যে তিনি প্রায় তিন হাজারের উপর ছবি আঁকেন।" মনে রাখতে হবে, ১৯৩৮ খ্রিষ্টাব্দের শেষে কলকাতায় 'চণ্ডালিকা' 'তাসের দেশ' ও 'শ্যামা'র অভিনয়ের পর ১৪ ফেব্রুয়ারি ১৯৩৯ তারিখে অমিয় চক্রবর্তীকে লেখা এক সুদীর্ঘ পত্রে রবীন্দ্রনাথ তাঁর শেষ জীবনের শিল্পচেতনা ব্যাখ্যা করতে গিয়ে লেখেন "বাক্যের সৃষ্টির উপরে আমার সংশয় জন্মে গেছে ... এই টলমলে অবস্থায় এখনো দুটো পাকা ঠিকানা পেয়েছি আমার বাণপ্রস্থের — গান আর ছবি ... কিন্তু এগুলোকে পুলিশ কেসের রিপোর্টরূপে বানানো হয় নি — গানে তার বাধা দিয়েছে — .. আমার চৈতন্য-অন্তঃপুরে রেখারূপের জাদু নর্তকীরা একদিন পর্দানশীন ছিল, আজ পর্দা সরিয়ে বেরিয়ে এসেছে। আমার কাছে এই অদ্ভুত প্রকাশলীলার আনন্দই যথেষ্ট।" (দ্র. ঠাকুর, ১৩৮১ : ২২৪-৩০) এবং এ চিঠিরও আগে লিখেছিলেন ভিন্ন চিঠিতে (দ্র. অদেব : ১৭৭) 'চিত্রাঙ্গদা' নৃত্যনাট্যরূপের কথা। বাক্‌পতি রবীন্দ্রনাথ শেষ জীবনে পৌঁছে ভাষার এক অন্য মাধ্যম আবিষ্কার করছেন রঙতুলি কলমের কালিতে। আমাদের মনে পড়বে, 'জাপানযাত্রী'তে 'অবনী' আর 'গগনে'র উপমায় বলা রবীন্দ্রনাথের এই কথা "অসীম যেখানে সীমার মধ্যে সেখানে ছবি ; অসীম যেখানে সীমা-হারানোয় সেখানে গান।" (দ্র. ঠাকুর, ১৩২৬ , '১৩৯৬': ৪২৮) এতকাল কবিতাকে 'উভচর' হিসাবে ছবি আর গানের মধ্যে 'চালিয়ে' আর 'উড়িয়ে' আর এক নতুন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ তিনি। জাপানীদের মধ্যে দেহভঙ্গীর যে সংগীত তাঁকে মুগ্ধ করেছিল, তা ক্রমশ "রূপ ও অরূপ"-এর দ্বন্দ্বমোচনে তাঁকে স্বতন্ত্রতর ছবি ও গানের জগতে ভিন্নভাবে সমর্থতর করে তুলল। 'শেষ বর্ষণ'-এর পালায় এই মিলনের কথাটি একবার উচ্চারণ করেন তিনি তাঁর 'নটরাজ'-এর মুখে, জানিয়ে দেন তাঁর পালায় "মিলনের আয়োজনও আছে। খুব বড়ো মিলন, অবনীর সঙ্গে গগনের।" (দ্র. ঠাকুর, ১৩২৬, '১৩৯৬' : ২০৯) ফলে তাঁর আঁকা ছবি আর তাঁর রচিত গানে

যতই প্রভেদ থাকুক না কেন, 'লিপিকা' থেকে শুরু করে শেষ জীবনের 'পত্রপুট' 'শ্যামলী' 'পরিশেষ' কাব্যের কবিতায় যেমন অবনী গগনের মেলবন্ধন তার পূর্বতন রূপের বদল ঘটিয়েছে, তেমনি গীতিনাট্যের যুগ থেকে পদ্য গদ্য নাটকের স্তর পেরিয়ে তাঁর পালানাটক শেষ পর্যন্ত নৃত্যনাট্যের সমুদ্রে মিশেছে।[২]

এরই মাঝখানে জেগে আছে 'চন্ডালিকা' গদ্যনাটক আর 'তাসের দেশ' নাটিকা। মূকাভিনয়ের সঙ্গে পাঠাভিনয়ের সংযোগে যে নতুন আভিনয়িক পরিচয় দিতে চেয়েছিলেন তিনি তাঁর নাটকে, হতে পারে তারই প্ররোচনায় লিখেছিলেন তিনি দুটি নারী চরিত্রের পারস্পরিক সংলাপ-ধৃত 'চন্ডালিকা'র নাট্যরূপ-শান্তিদেব যেমন লিখেছেন — "তাঁর ইচ্ছা ছিল, নাটকটির গদ্যাংশ তিনি নিজে আবৃত্তি করবেন, তার সঙ্গে পূর্ব পদ্ধতিতে (অর্থাৎ ১৯৩১ খ্রিষ্টাব্দের ১৪, ১৫, ১৭ ও ১৮ সেপ্টেম্বর ম্যাডান থিয়েটার, প্যালেস্ অব্ ভ্যারাইটিস হল, য়ুনিভার্সিটি ইনস্টিটিউটে অভিনীত 'গীতোৎসবে'-র দ্বিতীয় পর্বে "শিশুতীর্থ" কবিতার সঙ্গে শ্রীমতী দেবীর মূক নৃত্যাভিনয়ের মতো) অভিনয় করবেন শ্রীমতী দেবী। কথা ছিল নাটকের "প্রকৃতি"র চরিত্রে থাকবেন শ্রীমতী দেবী, আর 'মা' চরিত্রে অভিনয় করবেন নন্দিতা দেবী। নাটকের গানগুলি গাইবেন গানের দল, তার সঙ্গে হবে উভয়ের যথারীতি তালবদ্ধ নাচ।" (দ্র. ঘোষ, ১৩৮৫ : ৭৪) 'চন্ডালিকা' অবশ্য এইভাবে অভিনীত হতে পারে নি, শুধু কবির পাঠের সঙ্গে দিনেন্দ্রনাথের নেতৃত্বাধীন গানের দলের গানই পরিবেশিত হয়েছিল যথেষ্ঠ, ১২, ১৩, ১৪ সেপ্টেম্বর ১৯৩৩ খ্রিষ্টাব্দে ম্যাডান থিয়েটারে। তারপর দশ মিনিটের বিরামান্তে অভিনীত হয়েছিল 'তাসের দেশ'।

'গীতোৎসবে'র সম্পর্কে যা কিছু আলোচনা প্রকাশিত হয়েছিল পত্রপত্রিকায়, তার মধ্যে বেশির ভাগই ছিল ভারতীয় নৃত্যকলার পুনরুদ্ধারে রবীন্দ্র প্রচেষ্টার এই দৃষ্টান্তকে সাধুবাদ জানানো। (দ্র. চক্রবর্তী, ১৯৯৫ : ১৬৩) কিন্তু "বিচিত্রা" (উপেন্দ্রনাথ গাঙ্গুলী সম্পাদিত, কার্তিক ১৩৩৮ সংখ্যা) পত্রিকার "নানা কথা" অংশে রবীন্দ্রনাথের গীত উৎসব" নামে যে সচিত্র প্রতিবেদনটি প্রকাশ পায়, সেখানে লেখক ঠিকই লক্ষ করে বলেছিলেন :

" ... নৃত্যই এতকাল দেখিয়া আসিয়াছি। এবার দেখিলাম, শুধু সঙ্গীত নয়, একটি ভাবকে আশ্রয় করিয়াও সর্বোচ্চ অঙ্গের নৃত্য-কলা সম্ভব, — যদি সেই ভাব আপনার গভীরতায়, — এবং তাহার যে পরিচ্ছদ ভাষা তাহার লীলায়িত ছন্দে এবং সেই ছন্দের আবেগময়ী আবৃত্তিতে ইন্দ্রিয়াতীতকে স্পর্শ করিতে পারে। দেশে ও বিদেশে পৃথিবীর অনেক বিখ্যাত শ্রেষ্ঠ শিল্পীর নৃত্য দেখিয়াছি, কিন্তু নৃত্যকলার এ অভিনব কৌশল ও প্রণালী (টেক্‌নিক্) আর কোথাও দেখি নাই। ... নৃত্য সহযোগে এই আবৃত্তির মধ্যে শিল্পকলার একটা নূতন রূপ দেখিলাম। ইহাকে কি বলিব জানি না; ইংরাজীতে representation কথাটি যে ব্যাপক অর্থে ব্যবহার করা হয়, সেই রকম ব্যাপক অর্থে 'অভিনয়' কথাটি ব্যবহার করিলে ইহাকে অভিনয় বলা চলে। কিন্তু অভিনয়ের এ এক অভিনব রূপ আগে কোনো দিন দেখি নাই, সম্ভব বলিয়াও কল্পনা করিতে পারি নাই। ... সুদীর্ঘ পদ্য কবিতার প্রত্যেকটি ভাবই দর্শকেরা রঙ্গমঞ্চের উপর নৃত্যের মধ্যে প্রতিফলিত দেখিয়াছিলেন। ইহা অভিনয়েরই একটি রূপান্তর বটে, কিন্তু এ ধরনের অভিনয় পূর্বে কখনো দেখি নাই, ভবিষ্যতেও যে রবীন্দ্রনাথের কৃপা ভিন্ন অন্য কোথাও দেখিব, এমন আশা বড়ই কম, কেননা এমন অভিনয়ের জন্য যে শিল্পপ্রতিভার প্রয়োজন, তাহা অতীব বিরল।" (পৃ. ৫৫৯-৬১) স্মরণীয় এই যে এই 'গীতোৎসবে'র সময় থেকেই শরীরের ছন্দে নাট্যের প্রকাশমুহূর্তে মঞ্চে রূপকার রবীন্দ্রনাথ প্রাচীন ভারতীয় নাট্যের ধরনে সূত্রধারের অমোঘ উপস্থিতি নিয়ে উপবিষ্ট থাকাও শুরু করেন।

'চণ্ডালিকা' রচনার পিছনে এই প্রয়োগরীতির প্রেরণা নিশ্চয় বড়ো ভূমিকা নিয়ে থাকতে পারে, কিন্তু রাজেন্দ্রলাল মিত্রের নেপালী বৌদ্ধ সাহিত্যে শার্দূল-কর্ণাবদান আখ্যানসূত্রে প্রাপ্ত 'চণ্ডালিনী'র কাহিনীটির নাট্যসম্ভাবনা নিয়ে তিনি দীর্ঘ তিরিশ বছর ধরে ভাবিত ছিলেন — এ ইতিহাসে আমাদের জানিয়েছেন শঙ্খ ঘোষ তাঁর "তিন চণ্ডালী" প্রবন্ধে (দ্র. ঘোষ, ১৯৮১ : ২২-৩৮)। অপরদিকে, যে বিশেষ রূপে তিনি গদ্যনাটকটিকে সাজিয়েছিলেন, যেহেতু তার মঞ্চরূপায়ণ সম্ভব হল না, হয়তো তারই ফলে তাঁর আরও কিছু চরিত্র-সংযোজনা করে এই নাটককে নৃত্যনাট্যে রূপ দেবার আগ্রহ জাগে। নৃত্যনাট্য রূপ হবার পরেও 'চণ্ডালিকা' তার বৈশিষ্ট্য

হারায়নি। রবীন্দ্রনাথ হয়তো মূল সূত্রের সামাজিক সমস্যাকে লক্ষ্যবিন্দু না করে পৌঁছতে চেয়েছেন আত্মসমস্যাতেই এবং হয়তো শঙ্খ ঘোষের মতে "সেখানে পৌঁছবার প্রয়োজনে অবদানের শেষাংশের ভাবনাবস্তুকে নির্যাস হিসেবে কবি মিশিয়ে দিয়েছেন তাঁর প্রকৃতিচরিত্রের পরতে পরতে।" (দ্র. তদেব : ৩৫) — কিন্তু আঙ্গিকের বিচারে 'চন্ডালিকা' 'চিত্রাঙ্গদা' বা 'শ্যামা'র থেকে অনেক স্বতন্ত্র — নৃত্যনাট্য হলেও এর গানের ভাষাতেই রয়েছে প্রায় প্রাত্যহিক ভাষাভঙ্গির বুনোট, যে ভাষার ঘর্ষণে ঘর্ষণে নাটক জেগে ওঠে মুহুর্মুহু, গানের সুর যেখানে সংলাপের বাধ্য হয়ে অনুগমন করে, তার নাট্যস্বাভাবিকতাকে কোথাও ছাপিয়ে যেতে পারে না। এই কারণেই শ্রীশম্ভু মিত্র নাচ গান ও সংলাপের সমাহারে 'চন্ডালিকা'র একটি নাট্যপ্রযোজনা করবার কথা ভেবেছিলেন বলে মনে হয়। (দ্র. ঘোষ, ১৩৮৫ : ১২৩)

'চন্ডালিকা'য় তাহলে 'বাল্মীকি প্রতিভা'র পরীক্ষার সার্থক রূপায়ণ বলা চলে — দীর্ঘ সাতান্ন বছর পরে নাট্যকে তিনি পুনরায় গানের ভাষায় দৌড় করাতে পারলেন — কিন্তু এবার তার সঙ্গে সমর্থ ঐশ্বর্য নিয়ে পূর্ণ সহযোগ দিয়েছে নৃত্য।[৩] এই নৃত্য-নাট্যে যেমন এক সমাজসমস্যার আধারে রবীন্দ্রনাথের কালিদাসীয় মঙ্গলচেতনা ও বৌদ্ধ করুণার ভাবনা রূপ নিতে পেরেছে, তেমনি পদ্যনাটক 'চন্ডালিকা'র সহোদর 'তাসের দেশ' নাটিকায় ব্যঙ্গ আর শ্লেষের "অদ্ভুত রসাত্মক" আধারে, নৃত্যের অভিনব নানা মুদ্রায় আর গীতি-আয়োজনে ধরা পড়েছে আর এক আধুনিক অভিনয়ের রূপ। নিয়মতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার হাস্যকর চেহারা নবযৌবনের স্পর্শে কীভাবে ভেঙে পড়তে পারে, তার নাট্যরূপটিও নানা সংস্কার-সংযোজন-সংশোধনের মধ্য দিয়ে রচনা করেছেন রবীন্দ্রনাথ। 'তাসের দেশে'র দুই শিল্পী বিজনবিহারী ভট্টাচার্য তাঁর "রবীন্দ্রনাথের 'তাসের দেশ' বিবর্তনের ইতিহাস" প্রবন্ধে (দ্র. ভট্টাচার্য, ১৩৮১ : ২৯২-৩১৬) এবং শান্তিদেব ঘোষ তাঁর পূর্বোক্ত প্রবন্ধে বিভিন্ন পাঠ-পর্যালোচনা করে দেখিয়েছেন যে 'একটি আষাঢ়ে গল্প' (১২৯৯) থেকে পর্যায়ক্রমিকভাবে নানা অসম্পূর্ণ-সম্পূর্ণ খসড়া এবং প্রথম ও দ্বিতীয় সংস্করণের সংশোধনের মধ্য দিয়ে কীভাবে 'তাসের দেশ' নাটিকাটি রবীন্দ্রনাথের মনে তার পরিপূর্ণ রূপ ও চরিত্র নিয়ে ধরা দিয়েছে। সেই ইতিহাস আলাদাভাবে খুবই আগ্রহোদ্দীপক।

নাটিকাটির মহড়া চলার সময়েও নানারকম পরিমার্জনা চলেছে, এমন কি কলকাতার অভিনয়ের পর বোম্বাইয়ের একসেলসিয়র থিয়েটারে ২৭ ও ২৮ নভেম্বর ১৯৩৩ তারিখে অভিনয়ের দ্বিতীয় দিনে দর্শকদের বোধগম্যতার প্রয়োজনে সংলাপ অংশ পরিমার্জনা করে গান ও নাচের নতুন অবকাশ রচনা করে রবীন্দ্রনাথ যথারীতি তাঁর প্রতিমুহূর্তের সজীব নাট্যবোধের পরিচয় 'তাসের দেশে'ও রেখেছেন। কিন্তু বর্তমান প্রসঙ্গে আমরা এই নাটকের সংস্কার-ইতিহাস উল্লেখ করছি না এইজন্য যে 'তাসের দেশে'র মঞ্চোপযোগিতাই কেবল নয়, এমন অভিনব নাটক যে তখনও পর্যন্ত বাংলা নাট্যসাহিত্য ও নাট্যমঞ্চে বিরল, এ কথা তর্কাতীতভাবে সত্য। এই নাটককেও অভিনয়ের জন্য প্রস্তুত করে তুলেছেন দীর্ঘদিনের অক্লান্ত মহড়ায় এবং তাসেদের চরিত্রে অভিনয়ের মুখভঙ্গিতে ভাবের অপরিবর্তনীয় প্রায় মুখোশোচিত অভিব্যক্তি, নির্জীব, নিঃশব্দ এবং নিস্তব্ধভাবে নিয়মমত কুচকাওয়াজ করবার কায়দা থেকে শুরু করে যথোচিত অঙ্গভঙ্গী সহকারে বাচিক এবং নৃত্যাভিনয় নিজে অভিনয় করে দেখিয়ে দিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ তাঁর সত্তরোর্ধ্ব বয়সে। (দ্র- ভট্টাচার্য, ১৯৬২ : ৮৪-৯০) তাঁর নাট্যকর্মে বেশ কিছুকাল ধরেই মঞ্চসজ্জা, রূপসজ্জা, পোশাক পরিকল্পনা এবং আলোকসম্পাতে অপরিহার্য হয়ে উঠেছিল নন্দলাল বসু, সুরেন্দ্রনাথ করের রূপকল্পনা ও প্রয়োগ। নৃত্যনাট্য চর্চার কিছু আগে থেকে পুত্রবধূ প্রতিমা দেবীর সহযোগও হয়ে উঠছিল অনিবার্য। 'তাসের দেশ' নাটকের পোশাক পরিকল্পনায় এঁদের দীর্ঘদিনের চিন্তা এবং পরিশ্রম রবীন্দ্রনাট্যাভিনয়ের চূড়ান্ত উৎকর্ষের পর্যায়ে পৌঁছেছিল। এই নাটকের রচনায় দৃশ্যসংস্থান ও সংলাপ-পরম্পরায় যে আধুনিক নাট্যের প্রয়োগ সুভাব ফুটে উঠেছে, নানা চরিত্রের সমাহারে তৈরী হয়ে উঠেছে যে সিম্ফনিক বৈশিষ্ট্য, তার প্রতি সম্পূর্ণ সুবিচার করতে নন্দলাল প্রমুখ অভিনেতৃবর্গের নানা রঙের সমন্বয়ে পরিহিত কাপড়ের উপর পিসবোর্ডে রঙিন অলংকৃত কাগজ ও কাপড় লাগিয়ে যেসব অঙ্গাভরণ তৈরি করেছিলেন, তা কেবল আধুনিক নাট্যের উপযুক্ত বলেই মনে হয় না, রবীন্দ্রনাট্যপ্রয়োগের নান্দনিক বৈশিষ্ট্যেরও চরম প্রকাশ বলে মনে হয়। এই নাট্যের নানা চরিত্রের অভিনয়ের শরীরী মুদ্রায় যেমন বিশেষ কোনো নৃত্যশৈলীর দাসত্ব না করে নাটকের নাট্যময় ব্যঞ্জনা প্রকাশের উপযোগী নৃত্যভঙ্গীর অভিনবত্ব প্রকাশ করা হয়েছে, তেমনি পোশাক ও রূপসজ্জাতেও কোনো বিশেষ দেশ বা কোনো মামুলি প্রথার অনুসরণ না করে এমন এক শিল্পবোধের পরিচয় দেওয়া হয়েছে, যা

আমাদের এই মুহূর্তের আধুনিক নাট্যকর্মের সম্পূর্ণ সহযোগী দোসর বলে মনে হয়। শান্তিদেব ঘোষের পূর্বোক্ত প্রবন্ধের সঙ্গে মুদ্রিত অভিনয়ের আলোকচিত্র এবং নন্দলাল বসু কৃত পোশাকের স্কেচগুলি লক্ষ করলে আমাদের বিগত পঞ্চাশ বছরব্যাপী সচেতন নাট্যকর্মের সঙ্গে তাদের ঘনিষ্ঠতা অনায়াসেই অনুভব করা যাবে। শুধু তাই নয়, প্রথম রচনার দুটি দৃশ্য বর্ধিত হয়ে চারটি দৃশ্যে পরিণত হবার পর যে পদ্ধতিতে 'তাসের দেশ' অভিনীত হত, অর্থাৎ দ্বিতীয় দৃশ্যের পর দশ মিনিটের বিরতির জন্য একবার পটক্ষেপ ঘটানো, এছাড়া দৃশ্যান্তরে পর্দা না ফেলে, দৃশ্যানুযায়ী মঞ্চসজ্জার বদল না ঘটিয়ে এমন কি অভিনয়ের শুরু থেকেই রাজসভায় রাজা ও রানীর উপবেশন উপযোগী স্থান প্রস্তুত করে সমগ্র মঞ্চসজ্জার একটি বিশেষ অংশ হিশাবে দর্শকদের উপলব্ধিতে প্রতিষ্ঠিত করে 'তাসের দেশ' অভিনয়ের যে পরিকল্পনা সাজিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ, তাও আমাদের আজকের আধুনিক ভারতীয় নাট্যাভিনয় পদ্ধতির সঙ্গে সম্পূর্ণ মিলে যায়।

নৃত্যনাট্যের যুগে পুরোপুরি প্রবেশ করবার পর, কিংবা বলা যায় তারও আগে এই ১৯৩৩ খৃষ্টাব্দ থেকে, অর্থাৎ 'চণ্ডালিকা' 'তাসের দেশ' রচনা ও মঞ্চপ্রয়োগের সময় থেকে ১৯৩৯ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথ তাঁর আত্মীয়পরিজনদের নিষেধ উপেক্ষা করে, বাহ্যত বিশ্বভারতীর অর্থসংগ্রহের তাগিদে সেই 'স্বদেশী সমাজ' প্রবন্ধে কল্পনা করা যাত্রাপালার অধিকারীর মতো তাঁর আশ্রমিক শিল্পীগোষ্ঠী নিয়ে ছুটে বেড়িয়েছেন দেশের নানা শহরে। এই সব পরিক্রমায় 'চিত্রাঙ্গদা' 'শ্যামা' 'শাপমোচনে'র সঙ্গে সঙ্গে অভিনীত হয়েছে 'তাসের দেশ' কিংবা 'চণ্ডালিকা'। প্রত্যেকবার নতুন উৎসাহে তিনি এই দুরূহ নাটক দুটিকে উপযুক্ত মহলা দিয়ে প্রস্তুত করেছেন।[৪] এবং সেই প্রস্তুতিলব্ধ প্রয়োগ কুশলতায় তাঁর শিল্পীদল মুগ্ধ করেছেন কলকাতা এবং দেশের নানা জায়গার দর্শকদের, মুগ্ধ করেছেন মহাত্মা গান্ধী অথবা নেতাজী সুভাষ-চন্দ্র বসু [১৮৯৭ - ১৯৪৫ ?] প্রমুখ দর্শকদের। প্রমাণ করে দিয়েছেন, তাঁর শিল্প বা নাট্যসাধনা কেবলমাত্র জীবনসাধনা নয়, "উপস্থিত কালের দাবী এবং ভাঁড়ের লোকের অভিরুচি" (দ্র. রায়, ১৯৫৪ : ১৬৭)[৫] ইত্যাদির কাছে মাথা নত না করে সে সাধনা বরং দেশ ও কালের পরিবর্তনের সঙ্গে তাল মিলিয়ে, অনাগত কালের ছবি কল্পনা করে নিজের রূপের বদল খুঁজে খুঁজে এগিয়েছে। কিন্তু সেই নিরন্তর বৈচিত্র্যসন্ধানের মধ্যে ক্রিয়াশীল থেকে গেছে এক অখণ্ড ভারতীয়তার বোধ

যে ভারতীয়তা প্রাচীন জীবন ও শিল্পাদর্শের নির্যাস গ্রহণ করে আধুনিক বিশ্বের সঙ্গে যোগস্থাপন করতে পারে, কি রচনায়, কি প্রকরণে। রবীন্দ্রনাথের নাটক ও নাট্য-চর্চা তাই কোনো প্রথাসিদ্ধ নাটকীয়তা অথবা তার অভিনয়ের ঝুঁকিহীন অভ্যস্ত সড়ক ধরে চলে নি। তাঁর নাট্যাভিনয়ের দীর্ঘ ইতিহাস একথাও প্রমাণ করে নাট্যকর্ম তাঁর একমাত্র কাজ না হলেও তিনি কেবলমাত্র একটি নির্দিষ্ট বলয়ের দর্শকদের কাছেই নিজেকে বারবার পুনরাবৃত্ত করেন নি, বরং তাঁর সুদীর্ঘজীবনে সাহিত্য শিল্প সমাজ ও রাষ্ট্রনীতির দুই শতাব্দী আন্দোলনের প্রধানতম শরীক হয়ে এবং অধিকাংশ সময়ে শিল্পের নানান আন্দোলনকে প্রভাবিত নিয়ন্ত্রিত করে তিনি যেমন তাঁর দিগ-বিস্তারী ব্যক্তিত্বের পরিচয় রেখেছিলেন, যার ফলে আধুনিক কালের কবি-ঔপন্যাসিক-গল্পকার-সংগীতস্রষ্টা বা চিত্রশিল্পীদের পক্ষে তাঁকে অতিক্রম করে যাবার পক্ষে অনিবার্য, অমোঘ নানা বাধা দেখা দিয়েছিল— তেমনি তাঁর নাট্যচর্চাতেও একের পর এক বৈপ্লবিক সংস্কার নাট্যশিল্প এবং দর্শকসমাজের আ-তর্বলয়কে উদ্বেলিত করেছিল, ক্রমে ক্রমে জোড়াসাঁকো শান্তিনিকেতন কলকাতা হয়ে দেশের নানা জায়গায়। তাঁর বিস্ময়কর প্রতিভার বহুমুখিতার প্রশ্নটি বাদ দিয়ে শুধুমাত্র তাঁর নাট্যভুবনের এই ব্যাপ্তির ইতিহাস মনে রেখেই আমরা দেখব তাঁর সমকাল এবং উত্তরকালের বাংলা থিয়েটারে রবীন্দ্রনাটকের এই বিশ্বমুখী আধুনিকতা কতদূর মুক্তি খুঁজে পেয়েছে। দ্বিতীয় পর্বের সেই আলোচনার মধ্যেই নিহিত রয়েছে রবীন্দ্রনাটকের মঞ্চযোগ্যতা বিষয়ে প্রশ্ন তোলবার যাবতীয় যৌক্তিকতা ॥

।। টীকা ।।

১. পবিত্র সরকার এবং বার্ণিক রায় অবশ্য এই নিসর্গ-নাটক বা ঋতুনাটকগুলির স্বরূপ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে য়ুরোপীয় উৎসব-আচারের প্রসঙ্গ আলোচনা করেছেন এবং মিল্টন, ইয়েটস বা ফ্রেজারের নানা উৎসকথা তুলে এদের নাট্যধর্ম ব্যাখ্যা করেছেন (দ্র. সরকার, ১৩৮৮ : ৬৭-৮৫ ; রায়, ১৯৮৭ : ৯৩-১১৪)

২. আমাদের মনে পড়তে পারে, 'তপতী' নাটক লেখবার পর যখন রবীন্দ্রনাথের নাটক রচনার একটা প্রধান পর্ব শেষ হচ্ছে, যার কিছুকাল পরে শুরু হচ্ছে তাঁর রীতিমতো গদ্যকবিতার যুগ, সেই সন্ধিক্ষণে নির্মলকুমারী মহলানবিশকে তিনি লিখেছিলেন গদ্য ক্রমে ক্রমে জেগে উঠছে তাঁর মনে, তিনি সচেতন হয়ে উঠছেন গদ্যচলনের নানান বৈচিত্র্য বিষয়ে। তখনই তিনি ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন "বস্তুত গদ্যরচনায় আত্মশক্তি-র সুতরাং আত্মপ্রকাশের ক্ষেত্র খুবই প্রশস্ত। হয়তো ভাবীকালে সংগীতটাও বন্ধনহীন গদ্যের গূঢ়তর বন্ধনকে আশ্রয় করবে। কখনো কখনো গদ্যরচনায় সুর সংযোগ করবার ইচ্ছা হয়। লিপিকা কি গানে গাওয়া যায় না ভাবছ।" (দ্র. ঠাকুর, ১৩৮৭ : ৮৫) নাটকে গদ্যের সেই বিচিত্র ক্ষমতার উপযুক্ত প্রকাশ 'তপতী'র মতো রচনায় যে সম্ভব ছিল না, তার জন্য দরকার ছিল 'তাসের দেশ'-এর নির্মেদ তীক্ষ্ণধার কাটা কাটা সংলাপ এবং 'চণ্ডালিকা' নৃত্যনাট্যের মতো মিশ্র গানের আধার, সে কথা এই চিঠির সূত্রে বোঝা যায়।

৩. স্মর্তব্য নৃত্যনাট্য 'চণ্ডালিকা' প্রসঙ্গে প্রতিমা দেবীর এই আলোচনা :
"নাটকীয় রস নিবিড় করে তুলতে গেলে বাঁধা ভঙ্গীর নিয়মাবলী মেনে চলা যায় না। সেইজন্য চণ্ডালিকায় অধিকাংশ জায়গাতে স্বাভাবিক ভঙ্গীগুলিকে তালের কোঠায় ফেলা হয়েছে। ... দক্ষিণী নাচের বিচিত্র তাল ও ভঙ্গিমার মধ্য দিয়ে সুর সেখানে একটি অভিনব প্রহেলিকার রচনা করছে। নৃত্য অভিনয় না হয়ে যদি কেবল সুরের ধ্বনি দর্শকের কানে পৌঁছয় তা হ'লেও তাঁরা বুঝতে পারবেন যে সুর নিজেই একটি আ-তর তরঙ্গের প্রয়োজনা তৈরি ক'রে তুলেছে। চণ্ডালিকার কথোপকথনের ছন্দের মধ্যে সুরের সেই কারুকার্য মনকে টানে। ... সংগীতে যেমন মিশ্রণ ঘটেছে নৃত্যেও হয়েছে ঠিক তাই। .. এই যে

সংমিশ্রণ এতে ঐক্য নষ্ট না হয়ে নৃত্যকলা ও সংগীত সমভাবেই বৈচিত্র্য লাভ করেছে। এই রকমারি না থাকলে নাটক তৈরি হ'ত না। বিচিত্র সুর-সমাবেশের জোরে কথোপকথনের ছন্দ সচল ও জোরালো হয়ে উঠেছে, তানও প্রথাগত নিয়ম থেকে মুক্তি পেয়ে নিজের আবেগকে অবাধে প্রকাশ করেছে। কোথাও কোথাও আধুনিক সাহিত্যের গদ্য কবিতার মতো ভাব আপনাকে ছন্দের বন্ধন থেকে মুক্তি দিয়েছে। নৃত্যের সেই বন্ধনহীন রূপ নূতন আকৃতি নিয়ে নাটকীয় সংঘাতের মধ্যে এক অকৃত্রিম রস ও শক্তিকে জাগিয়ে তুলেছে।" (দ্র. দেবী, প্র, ১৩৫৬ : ২৪-২৬) প্রতিমা দেবীর এই দীর্ঘ উদ্ধৃতির সমর্থন নিয়ে আমাদের সিদ্ধান্ত, যে অর্থে 'বাল্মীকি প্রতিভা' গীতিনাট্য হয়েও মূলত নাটক বা নাট্য সেই অর্থে 'চণ্ডালিকা' ও নৃত্যনাট্যে রূপান্তরিত হয়েও মূলত নাট্য বা নাটক।

৪. ১৯৩৮ খ্রিষ্টাব্দের মার্চে 'চণ্ডালিকা'র মহড়াজনিত ব্যস্ততা এবং 'নাটকীয় নিবিড়তা'র পক্ষে বাধাজনক কিছু নাচগান বর্জন করে এই দুরূহ নাটককে অভিনয়ের জন্য প্রস্তুত করা কিংবা ১৯৩৯-এর ফেব্রুয়ারিতে ঐ একই নাটকের প্রস্তুতি, এবং একই সময়ে 'তাসের দেশ' মহলায় তাঁর ব্যস্ততার নানা ছবি পাওয়া যায় নির্মলকুমারী এবং প্রতিমা দেবী, অসিতকুমার হালদার, সুভাষচন্দ্র বসুকে লেখা পত্রাবলীতে। বাহুল্য বোধে সেইসব পত্রের বিস্তারিত উল্লেখ করা হল না। বস্তুত ১৯৩৩ থেকে ১৯৩৯ পর্যন্ত বারবার নানা উপলক্ষ্যে এই নাটক দুটির অভিনয় আয়োজন করেছিলেন তিনি।

৫. চিঠিটি লিখেছিলেন রবীন্দ্রনাথ শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় [১৮৭৬-১৯৩৮]-কে, তাঁর "মোড়শী" উপন্যাসের নাট্যরূপের সমালোচনা করে, তারিখ ছিল ২১ ভাদ্র ১৩২৯।